ঢাকাই স্মৃতিকথা

ঢাকার গাড়োয়ানদের গান ও আখ্যান*

অজিতকৃষ্ণ বসু

''তুই আমার চান্দের কণা,
আন্ধার কইরা কই গেলি লো?
অন্ধার কইরা কই গেলি লো,
পাগল কইরা কই গেলি লো?

তরে লইয়া যামু ঢাকা
বাক্স ভইরা আনমু টাকা,
একলা ঘরে তরে ফেইলা
আমি প্রাণে বাঁচ্‌মু না লো!

তরে দেইখা রাস্তার লোকে
বুক থাপ্‌ড়াইয়া মর্‌ব শোকে।
.....

এই গানটি ঢাকা সহরের গাড়োয়ানদের মুখে অনেক শুনেছি। ''দে কানাইয়া বসন আমার, কুলনারী মরি লাজে এর'', ''হাওয়া - গাড়ি চইলা গেল গো, (আমার বন্ধু) আইল না'' প্রভৃতি গানের মতোই এ গানটিও তাদের পরম প্রিয় ছিল। গোড়ার গাড়ি চালাতে চালাতে তারা গলা ছেড়ে প্রাণের আনন্দে এসব গান গাইত। আমি অবশ্য পুরনো আমলের অর্থাৎ পাকিস্তান জন্মাবার আগের স্মৃতি থেকে বলছি, কারণ ১৯৪০ সালের পর আমি আর ঢাকা শহরে যাইনি।

গানটির কথাগুলি আমার সম্পূর্ণ মনে পড়ছে না, তাই আংশিক উদ্ধৃতি দিলাম। ঢাকাই গাড়োয়ানদের ভাষার সঙ্গে যাঁদের পরিচয় নেই, তাঁদের জন্য তাঁদের বোধগম্য ভাষার অনুবাদ করেছি :

''তুই আমার চাঁদের কণা,
আধাঁর করে কই গেলি লো?
আঁধার করে কই গেলি লো,
পাগল করে কই গেলি লো?

তোকে নিয়ে যাব ঢাকা,
বাক্স ভরে আনব টাকা,
একলা ঘরে তোকে ফেলে
আমি প্রাণে বাঁচব না লো!

তোকে দেখে রাস্তার লোক
বুক চাপ্‌ড়ে মরবে শোকে''।
.....

গানটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করারও বোধহয় একটু প্রয়োজন আছে। যে সময়ে ঢাকায় গাড়োয়ানদের (এবং কখনো কখনো কাঠের দুরমুশ - হস্ত - পিটানেওয়ালা মজুরদের) মুখে এ গান শুনেছিলাম, তখন ঢাকার সুধী সমাজের ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় হয়েছিল কাজী নজরুলের লেখা এবং হিজ মাস্টার্স ভয়েস রেকর্ডে জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামীর গাওয়া একটা মর্মস্পর্শী গান :

''শূণ্য এ বুকে পাখি মোর
ফিরে আয় ফিরে আয়।
তোরে না হেরিয়া সকালের ফুল
অকালে ঝরিয়া যায়।
.....
তুই ফিরে এলে ওরে চঞ্চল,
আবার ফুটিবে বনে ফুলদল,
ধূসর আকাশ হইবে সুনীল
তোর চোখের চাওয়ায়।''

এই গানটিতে আছে ফিরে আসবার আহ্বান, এবং যাকে আহ্বান জানানো হচ্ছে সে ফিরে এলে কি কি হবে তার কিঞ্চিৎ বিবরণ। গাড়োয়ানী গানটিতেও তাই। প্রথমেই সুন্দরীকে 'চাঁদের কণা' বলে সাদর সম্বোধন করে বলা হয়েছে, ''ওগো আমার চাঁদের কণা, আমার জীবন (অথবা ঘর) অন্ধকার করে, আমাকে পাগল করে কোথায় গেলে?''

''ফিরে এসো'' মিনতিটা এই প্রশ্নের মধ্যেই যে উহ্য আছে, সেটা গানের পরবর্তী অংশ থেকেই বোজা যায়, কারণ তাতে বলা হয়েছে পলাতকা 'চাঁদের কণা' ফিরে এলে পর গায়ক তাকে নিয়ে ঢাকা (টাকা রোজগারের পক্ষে সুবিধাজনক শহর) যাবে এবং বাক্স ভরে টাকা আনবে। (বলা বাহুল্য সেই টাকা এনে সে সুন্দরীর পায়েই ঢেলে দেবে)। সুন্দরীকে ঘরে একা ফেলে সে কিছুতেই নিশ্চিন্ত মনে বাইরে থাকতে পারবে না, চিন্তা করেই মরে যাবে। হয় তো এর মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে সুন্দরীর বিরহ সে সইতে পারবে না, অথবা অমন সুন্দরী 'চাঁদের কণা' ঘরে একা থাকলে পাছে অন্য কোনো প্রেমিক এসে সেই সুযোগ গ্রহণ করে, সেই ভয়ে সে অস্থির হবে। যখন 'চাঁদের কণা'কে নিয়ে রাস্তায় বেরোবে, তখন 'চাঁদের কণাকে দেখে তার রূপে মুগ্ধ রাস্তার লোকেরা প্রেম - পিপাসায় বা ঈর্ষায় কাতর হয়ে বুক চাপড়াতে থাকবে।

এই গানগুলি গ্রামোফেন কোম্পানি একদা রেকর্ড করিয়ে বাজারে ছেড়েছিলেন, কিন্তু

'দাড়িতে তেঁতুল - গুড়
মাখি' আর কত দূর
আম্রের সুস্বাদু যাবে জানা?

গিলিয়া কলের জল
কেহ কি পায় সে ফল
পায় যা শ্যাম্পেন হলে টানা?"

ঢাকাই গাড়োয়ানদের মুখে গানগুলি যে অপরূপ অনবদ্যতায় মণ্ডিত হয়ে উঠত, যান্ত্রিক রেকর্ড সঙ্গীতে তার আস্বাদ পাওয়া সম্ভব নয়। বোধকরি সেই কারণেই এই গানের রেকর্ডগুলি প্রবাদোক্ত গরম কেকের মতো হু হু করে বিক্রি হয়নি।

গানে এই গাড়োয়ানদের কারও শিক্ষিত পটুত্ব ছিল না, ছিল সংস্কৃত কবিরা যাকে বলেছেন অশিক্ষিতপটুত্ব। প্রাণের আনন্দ কণ্ঠে গান হয়ে ফুটে উঠত বলেই তা শ্রোতাদের— অন্তত : আমার— প্রাণ স্পর্শ করত। তারা গান গাইত গান গাইবার আনন্দে। কাউকে সোনাবার জন্য নয়। গান তারা বসেই গাইত— গাড়ির ছাতের সম্মুখভাগে গাড়োয়ানের আসনে— কিন্তু তাদের গান বৈঠকী গানের পর্যায়ে পড়ত না। এবং গতিহীন গাড়ির ওপর বসে গান গাইতেও তাদের কখনো শুনিনি। গতির সঙ্গে তাদের গীতির বোধ হয় কোনো রকম কার্য - করণ সম্পর্ক ছিল।

যে গানগুলির কথা বললাম, সেগুলি গাড়োয়ানরা রেকর্ডের মুখ থেকে শুনে শেখেনি। আগে তাদের মুখে মুখে গীত হয়ে তারপর রেকর্ডে উঠেছিল। কিন্তু গ্রামোফোন রেকর্ডে শুনে ভালো লাগলেও তারা সে গান গলায় তুলে নিতে তাদের রুচি, প্রয়োজন এবং সাধ্য অনুযায়ী অদল বদল করে নিয়ে। সে সব গানের মূল রূপ এবং তাদের গাড়োয়ানী রূপান্তরে কিছু প্রভেদ থাকত। যেমন ঢাকায় খ্যাতিমতী রেকর্ড - গায়িকী শ্রীমতী হরিমতির বহু - বিক্রীত রেকর্ডের গান ''ঝরা ফুল দলে কে অতিথি''র প্রথম লাইনটির ঢাকাই গাড়োয়ানী রূপান্তর হয়েছিল ''ঝরা ফুল দলের ভিরতে কেউগা অতিথি?'' ('ভিরতে মানে 'কে' অথবা 'কে গো'।) এটা অবশ্য ইচ্ছাকৃত তামাশা বা প্যারডি; কিন্তু 'সিরিয়াস' বা গুরুগম্ভীর ভাবে রেকর্ডের গান নকল করে গাইতে গিয়ে নিজের অজানিতে তারা মাঝে মাঝে যা করে ফেলত, তা আমাদের অ-গাড়োয়ানী কানে অনেকটা প্যারডির মতোই শোনাত। যেমন, কাজী নজরুল ইসলামের ''কে বিদেশী মন - উদাসী বাঁশের বাঁশী বাজাও বনে?', গানখানা। এ গানখানা ঢাকার সাধারণ বাজার মাত করেছিল। মাত করার কারণ কবিগুরুর ''গান - ভঙ্গ'' কবিতায় পাওয়া যাবে :

''একাকী গায়কের নহে তো গান,
গাহিতে হবে দুইজনে।
গাহিবে একজন ছাড়িয়া গলা,
আরেকজন গাবে মনে।"

যে গান অতি সাধারণ শ্রোতারাও মনে মনে গাইবার পক্ষে যথেষ্ট সরল সহজ, সে গান তত সহজে জনপ্রিয় হয়। যে গান সাধারণ শ্রোতার মনে মনে গাইবার মতো যথেষ্ট সহজ নয়, সে গান জনপ্রিয় হয় না। ''কে বিদেশী মন - উদাসী' গানখানা গজল ঢঙের সহজ গান, তালে বা সুরে কিছুমাত্র কঠিনতা নেই, তাই গানখানা ঢাকার গাড়োয়ানদের খুব ভালো লেগে গিয়েছিল। কিন্তু তারা শ,য এবং স তিনটিই ইংরেজি 'এস্' অর্থাৎ খাঁটি দন্ত্য 'স'-র মতো উচ্চারণ করত এবং চন্দ্রবিন্দু উচ্চারণ করবার মতো তৈরি নাক তাদের ছিল না বলে তারা গাইত :

''কে বিদেশী মন - উদাসী,
বাসের বাসী বাজাও বনে?"

পরের লাইনের ''সুর - সোহাগে তন্দ্রা লাগে'' তাদের মুখে হয়েছিল ''সুর - সোহাগে তণ্ডো লাগে।" ফলটা অ-গাড়োয়ানী শ্রোতাদের কানে কি রকম দাঁড়ত সহজেই অনুমেয়।

ঢাকাই গাড়োয়ানদের সঙ্গীতপ্রিয়তার মতোই আরেকটি বিশেষত্ব ছিল তাদের অসাধারণ সহজাত হিউমার বা কৌতুক - বোধ। কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি।

এক ভদ্রলোক গাড়োয়ানকে তাঁর গন্তব্যস্থানের নাম বলে বললেন, ''কত ভাড়া নেবে বলো।"

গাড়োয়ান বলল, ''এউগা ট্যাহা দিয়ান মহারাজ।" অর্থাৎ ''একটা টাকা দেবেন, মহারা।"

ভদ্রলোকের মনে হল গাড়োয়ান ন্যায্য ভাড়ার দ্বিগুণ চাইছে। তিনি বললেন, ''আট আনায় যেতে পারো না?"

গাড়োয়ান অম্লানবদনে বলল, ''পারুম না ক্যান, মহারাজ? কিন্তু ভিতরে বহাইয়া ল্যাওন যাইন না। (অর্থাৎ, আপনাকে চাকার সঙ্গে বেঁধে নেব, মহারাজ।)

আরেক ভদ্রলোক এইভাবেই এক টাকাই গাড়োয়ানকে খুব কম ভাড়ার কথা বলেছিলেন। শুনে গাড়োয়ান জিভ কেটে আস্তে আস্তে বলেছিল, ''আস্তে কন মহারাজ, ঘোড়ায় হুনব।" অর্থাৎ, এত কম ভাড়ার কথা শুনলে ঘোড়াটাও হাসবে।

এক গাড়োয়ানের গাড়ির ঘোড়াকে হাড্ডিসার দেখে এক ভদ্রলোক সন্দিহান হলেন এই ঘোড়া তাঁকে তাঁর মালপত্র এবং পরিবারবর্গ সহ টেনে নিয়ে যেতে পারবে কিনা। সেই সন্দেহ তিনি প্রকাশও করলেন।

ভদ্রলোকের কথায় বিস্মিত হয়ে দুচোক কপালে তুলে গাড়োয়ান বলল, ''কন কি, মহারাজ? পঙ্খীরাজ ঘোড়া; দ্যাহেন না য্যান উড়াল দিবার চায়?" (অর্থাৎ 'এ আপনি কি বলছেন, মহারাজ? এ যে পঙ্খীরাজ ঘোড়া। দেখছেন না যেন ওড়া শুরু করতে চাইছে?")

ঘোড়াটার দেহের দুদিকেই ঘা ছিল। ঘোড়াটা যে সত্যিই পঙ্খীরাজ, তার অকাট্য প্রমাণরূপে ঐদিকে ভদ্রলোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে গাড়োয়ান বলল, ''পাঙ্খা দুইটা কাইটা ফ্যালাইঠি ঘাও ভি হুকায় নাই।" (অর্থাৎ ''এই পঙ্খীরাজের দুটো পাখাই কেটে দিয়েছি। এখন পর্যন্ত তার ঘা-ও শুকোয় নি।")

স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েদের গাড়ির ভেতরে বসিয়ে এক ভদ্রলোক গাড়ির ওপরের বসেছিলেন গায়োযানের পাশে। গন্তব্যস্থানে পৌঁছে গাড়োয়ান ঘোড়ার রাশ টেনে গাড়ি থামাল। ভদ্রলোককে এইবার তাঁর সেই উচ্চাসন থেকে পথে নামতে হবে। মাঝখানে দুটি স্তর—প্রথমে একটা রেকাবিতে পা রেখে তারপর গাড়িতে উঠবার পাদানিতে নেমে সেখান থেকে পথে নামতে হবে। কিন্তু ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি নামতে গিয়ে হোক অথবা অনবধানতার জন্যই হোক বা অন্য যে কারণেই হোক, ওপর থেকে সোজা রাস্তায় পড়ে গেলেন, তিন দফায় আস্তে আস্তে নামা তাঁর হল না। পড়ে গিয়ে ভদ্রলোক বেশ একটু ঝাঁকানি খেলেন, ভাগ্য ভাল ছিল বলে জোর জখম হলেন না।

গাড়োয়ান নেমে এসে ভদ্রলোককে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করে তংার জামায় ধুলো ঝেড়ে দিতে দিতে বলে, ''চোট একটু পাইল্যান, জবর জল্‌দি।" অর্থাৎ, ''ধাপে ধাপে ধীরে ধীরে না নেমে সরাসরি ধপ্ করে পড়ে যাওয়ায় মহারাজ একটু আঘাতে পেলেন বটে, কিন্তু নামলেন খুব চট করে। এ যে সময় বাঁচল, তাতেই আপনার আঘাত - প্রাপ্তির ক্ষতিপূরণ হয়ে গেল।"

একবার ঢাকা থেকে আমি কলকাতায় আসবার সময় বাড়ি থেকে রওনা হবার আগে ঘোড়ার গাড়ির ছাদে জিনিসপত্র তোলার কাজে গাড়োয়ানও সাহায্য করছিল।

বিছানা, বাক্স প্রভৃতি কোনোটিই ভারি ছিল না, কিন্তু বাক্সটা তুলবার সময় গাড়োযান এমন অভিনয় করল যেন সেটা তুলতে তার প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে। কয়েকবারের চেষ্টায় বাক্সটা তুলে হাঁপাতে হাঁপাতে গাড়োয়ান বলে উঠল, ''বাপরে বাপ! বাক্স না য্যান সিন্দুক! গোড়ার জবর পরেশানি হইব মহারাজ। অরে দানা লখিলাইবার লাইগা দউ গণ্ডা পয়সা বেসী দিয়্যান।"

অর্থাৎ এতো বাক্স নয়, যেন লোহার সিন্দুক। এই বোঝা টানতে ঘাড়াটা বিষম হয়রাণ হবে। অতএব মহাজার আমাকে যা বাড়া দেবেন, তার ওপর অতিরিক্ত দুগণ্ডা পায়সা দেবেন ঘোড়াটাকে দানা খাওয়াবার জন্য।

হাল্‌কা বাক্সকে লোহার সিন্দুকের মতো করে তোলার অভিনয়ে গাড়োয়ান এমন চমৎকার কৌতুক সৃষ্টি করেছিল যে, তার বিনিময়ে দুগণ্ডা পয়সা বেশি দিতে দ্বিধা করিনি।

রসিকতাপ্রিয় গাড়োয়ান কিন্তু অতিরিক্ত দু আনার প্রার্থনাটা নিছক কৌতুক করেই জানিয়েছিল। সেটা তার দাবি বা আশার অভিব্যক্তি নয়। ভাড়া রফা হয়েছিল চার আনা; স্টেশনে পৌঁছে যখন গাড়ি থেমে নেমে গাড়োয়ানকে একটু সিকি আর একটা দুয়ানি দিলাম, সে তখন এক সেকেণ্ড আমার মুখের দিকে তাকাল। তারপর ঘোড়াটার পাঁজরে একটা আঙুলের খোঁচা মেরে বলে উঠল, ''আবে* ঐদিকে চাস কি? মহারাজরে সালাম দে।''

খোঁচা খেয়ে বোধ হয় গোড়াটা চিঁ হিঁ হিঁ ডাক ছাড়ল একবার। গাড়োয়ান আমার দিকে তাকিয়ে বলল, ''ঘোড়ায় আপনেরে সালাম দিচ্ছে, মহারাজ।'' ঘোড়াটি যেন আমার দাতাকর্ণত্ব বুঝতে পেরে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে ঘোড়াই ভাষায় সেলামে, আর তার সেই ভাষা বুঝতে পেরেছে গাড়োয়ান।

ঘোড়ার ভাষা বুঝতে পারা আর ঘোড়ার সঙ্গে কথা বলার ভাণ করাটা ছিল একাধিক ঢাকাই গাড়োয়ানের প্রিয় রসিকতা। আরেকটি উদাহরণ দিই। এক ভদ্রলোক কলকাতা থেকে এসে নেমেছে টাকা শহরের পূর্ব প্রান্তে দোলাইগঞ্জ স্টেশনে, এখান থেকে ঘোড়ার গাড়ি চড়ে যাবেন পাটুয়াটুলি চৌমাথার ধারে। তিনি বছরখানেক আগে একবার এসে ঐ একই জায়গায় গিয়েছিলেন, গাড়ি ভাড়া দিয়েছিলেন ছয় আনা। এবারও ঐ ছয় আনাই দেবেন, গাড়িতে উঠবার আগেই জানালেন গাড়োয়ানকে।

ছয় আনা ভাড়ার কথা শুয়ে গাড়োয়ান সম্মতি প্রকাশ না করে নীরব রইল দেখে ভদ্রলোক প্রশ্ন করতে গাড়োয়ান সবিনয়ে বলল, ''হুজুর , দেখি গোড়ায় কি কয়।'' (আর্থাৎ 'ঘোড়াটার মত না নিয়ে বলতে পারছি না ছ' আমায় যাবে কি না।')

ঘোড়াটার কানের কাছে মুখ রেখে খুব গোপনে কানে কানে কথা বলার ভঙ্গিতে গাড়োয়ান জিজ্ঞাসা করল :

'কি রে*, কি কমু মহারাজরে? ছ' আনায় যাবি?''

ঘোড়া চুপ, অথচ ঘোড়ার মতটা জানা একান্তই দরকার, কারণ তার মত ছাড়া কিছু করা যাবে না। গাড়োয়ান তাই ঘোড়ার ঘারে হাত বুলিয়ে আদর করতে করতে বলল, ''আবে ক-না, সরম করস্ ক্যান্?'' (অর্থাৎ আরে বল্ না, এত লজ্জা করিস কেন?)

ঘোড়াটা হয়তো এমনিতে কোনো মতই প্রকাশ করতে না, কিন্তু গাড়োয়ান হাত বুলোতে বুলোতে একবার গাড়ে কায়দা করে চিম্‌টি কেটে দিতেই আওয়াজ করে উঠল।

ভদ্রলোক গাঠেড়ায়ানের ঘোড়াই কৌতুক উপভোগ করে হেসে বললেন, ''কি হে, কি কয় তোমার ঘোড়া?''

ঘোড়ার ভাষাকে মানুষী ভাষায় অনুবাদ করে গাড়োয়ান বলল, ''ঘোড়ায় কয় ওউগা আধ্‌লি পুরা কইরা দিয়্যান মহারাজ।''

অর্থাৎ ঘোড়া বলছে মহারাজ ছ'আনা দিতে চেয়েছেন, তার সঙ্গে আর মাত্র দু'আনা যোগ করে একটা আধুলি— অর্থাৎ টাকার অর্ধেক - পুরো করে দিন।

ভদ্রলোক প্রসন্ন চিত্তেই ঘোড়ার অনুরোধ রাখতে রাজি হয়েছিলেন।

ঢাকার গাড়োয়ানদের কৌতুক - প্রিয়তা এবং রসিকতার এই ধরণের আরো অনেক গল্প বলা যেতে পারে। ইংরাজিতে যাকে বলা যায় 'রেডি উইট (ready wit) এবং বংলা পরিভাষা 'প্রত্যুৎপন্ন - রসিকতা,' এই অশিক্ষিত গরীব গাড়োয়ানদের মগজে তার এত প্রাচুর্য কি করে থাকত তা ভেবে বিস্ময় বোধ হয়। শিক্ষিত মগজ আর শাণিত বুদ্ধি নিয়েও এদের সঙ্গে রসিকতার লড়াইতে জেতা সহজ ছিল না।

আমরা বিশ্বাস এদের সহজ কৌতুক রসিকতার পিছনে ছিল এদের সহজ জীবন - ধারা এবং সহজ জীবন - দর্শন। জীবনকে এরা অতি সহজ ভাবে নিয়েছিল, বাঁচার আনন্দকে এরা রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করত, রবীন্দ্রসঙ্গীত জানা থাকলে এরা নিজেদের মনের ভাব প্রকাশ করতে গাইতে পারত :

''কি পাই নি, তার হিসাব মিলাতে
মন মোর নহে রাজি।''

জীবনে কি পায়নি, তার হিসাব মেলাতে না বসে যেটুকু পেয়েছি তার পুরো রসটুকু নিঃশেষে আস্বাদন করাটাই ছিল তাদের জীবন দর্শন। ঢাকায় আমাদের পাড়ার (গোণ্ডারি অর্থাৎ ইক্ষু প্রচুর পরিমাণে এবং অত্যুৎকৃষ্ট মানে উৎপন্ন হত বলে যার নাম ছিল 'গেণ্ডারিয়া') ডাকঘরের পাশেই ছিল একটা বড় 'আরগাড়া' অর্থাৎ গোড়ার গাড়ির গারাজ, তাতে কয়েকজন গাড়োয়ানের ঘোড়া এবং গাড়ি পালাক্রমে বিরাজ ও বিশ্রাম করত। প্রত্যেক গাড়োয়ান প্রত্যেক দিন গাড়ি চালাত না, প্রত্যেকেই সপ্তাহান্তে বা পক্ষান্তে একদিন করে বিশ্রাম করত। এই আরগাড়ায় গাড়োযানদের আড্ডা উপভোগ করতে দেখেছি অনেক বিকেলে, অনেক সন্ধ্যায়। আড্ডায় চলত কখনো তাস, কখনো পাশাখেলা কখনো - বা শুধু গল্পসল্প। তিন নম্বরটি অবশ্য তাস আর পাশাখেলার সঙ্গে সঙ্গেও চলত।

আমাদের পাড়ার এই 'আরগাড়া'র গাড়োয়ানদের সঙ্গে বেশ অন্তরঙ্গতাই হয়ে গিয়েছিল, এবং ওদের চরিত্রের বিচিত্র অথচ সরল মাধুর্য আমাকে আকৃষ্ট করেছিল। তাই অনেক সময় ওদের বৈয়তী খেলার আড্ডা কাছে দাঁড়িয়ে উপভোগ করতাম। তাতে ওদের বা আমার কোনরকম অস্বিস্তি বোধ হতো না। আমার নিকট - উপস্থিতিতে ওদের আড্ডানন্দের সুর বা তাল কেটে যেত না; শুধু ওরা নিজেদের ভেতর অনেক সময় যে অছাপ্য (অর্থাৎ যা ছাপা চলে না) খিস্তি মাখানো রসিকতা করত, আমার সামনে (এবং আমার সম্মানে) তা থেকে বিরত থাকত। ওদের সেই সংযম আর সুরুচির স্মৃতি এখনো বড় মিষ্টি লাগে। আমি হলামই - বা তখন স্কুলের ছাত্র, তবু আমি তাদের পৃষ্ঠপোষক 'বাবু' সমাজের একজন প্রতিনিধি, সেই হিসেবে আমার মর্যাদা রক্ষা করা তাদের কর্তব্য, এ বিষয়ে তারা সচেতন ছিল।

এটা কিন্তু তাদের 'ইনফিরিওরিটি কম্‌প্লেকস্' (inferiority complex) বা হীনতাবোধ থেকে উৎপন্ন ছিল না, কারণ গাড়োয়ান হলেও তারা নিজেদের হীন মনে করত না। ঢাকার গাড়োয়ানরা সবাই ছিল ইস্‌লাম ধর্মবলম্বীয়। ঢাকায় হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন বা খ্রীষ্টান গাড়োয়ান কেন ছিল না তা বলতে পারি না, শুধু এইটুকু জানি ঘোড়ার গাড়ি চালাবার পেশা ও ব্যবসা ছিল মুসলমানদের একচেটিয়া। এই গাড়োয়ানদের মনের গহনে স্থায়ী আসনে উপবিষ্ট ছিল একটি ধারণা যে, তারা ভারতে ভূতপূর্ব শাসকদের ধর্মভাই বা সধমী, তারা যে গাড়োয়ানী হাতে লাগাম আর চাবুক ধরে ঘোড়ার গাড়ি চালাচ্ছে, তাদের সেই হাতের ধমনীতে বইছে ভারতের ভূতপূর্ব (অর্থাৎ বৃটিশ পূর্ব) শাসক জাতির রক্ত।

*উপশিরোনামটি সম্পাদক প্রদত্ত।

* 'কি - রে' গাড়োয়ানী রূপান্তর।

সৌজন্যে : কালি ও কলম। ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৭৬। পুরানো বানান অপরিবর্তীত রাখা হয়েছে।